আংশিকভাবে ঢুকে পড়তে পারে। যে-সব প্রক্রিয়ায় নদী উপত্যকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে সেগুলি হল—

১) নদী তার মাথার দিকে ক্ষয়ের সাহায্যে উপত্যকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে পারে। সাধারণত গালি ও র‍্যাভিন-এর ক্ষেত্রে এই দ্রাঘণ প্রক্রিয়া (Elongation) দেখা যায়। এছাড়া যে-সব ক্ষেত্রে নদীর উৎস অংশে কোনো প্রস্রবণ থাকে সেখানেও মাথার দিকে ক্ষয়ের সাহায্যে নদী তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং একই সঙ্গে উপত্যকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে পারে। উৎসস্থলে প্রস্রবণ থাকলে এই অবস্থা বেশি দেখা যায়। সেক্ষেত্রে নিম্নক্ষয়, গুহাক্ষয় এবং ছোট ছোট ধস তৈরি হয়ে উৎস অঞ্চলে নদীর দ্রাঘণ ঘটে।

২) নদী তার বাঁক সৃষ্টির মাধ্যমে উপত্যকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে পারে, কেননা উৎস থেকে মোহনার মধ্যে নদীর এই বাঁক নেওয়া প্রবাহ তার সরল প্রবাহের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ।

৩) নদীর মোহনায় ভূমিভাগের উত্থান ঘটলে বা সমুদ্রতল নেমে গেলে নদী তার উপত্যকাকে নতুন উপকূলরেখা পর্যন্ত দীর্ঘ করে। কোনো কোনো সময়ে বদ্বীপ অবক্ষেপণের সাহায্যেও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গঙ্গা বদ্বীপের শীর্ষদেশ মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণ চব্বিশপরগণা পর্যন্ত একটি অবনমিত এবং প্রাচীন শিলায় তৈরি ভূমির ওপর অগভীর সমুদ্রের মধ্যে এই বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। হুগলি নদীর মোট দৈর্ঘ্যের মধ্যে এই বদ্বীপ প্রবাহ অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ভূমির উত্থান না ঘটলেও বেঙ্গল বেসিনের মধ্যে যে বদ্বীপভূমির সৃষ্টি হয়েছে তা নদী উপত্যকার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

৪.৭.২ ক্ষয়জনিত ভূমিরূপ

নদীর ক্ষয়ের ফলে তার উপত্যকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। উপত্যকা বলতে প্রকৃতপক্ষে নদীর দু পাশের ক্ষয়ীভূত অল্প ঢালযুক্ত ভূমিভাগকে বোঝালেও পার্বত্য অংশে নদী উপত্যকা অনেক সংকীর্ণ থাকে এবং তার আকৃতি ইংরেজী 'V' -এর মতো হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পার্বত্য এলাকায় নদী ও নদী উপত্যকা সমান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বৃষ্টিবহুল ক্রান্তীয় অঞ্চলে নদী উপত্যকাগুলি সাধারণত গভীর ও সংকীর্ণ হয়, যেহেতু বেশি বৃষ্টির কারণে উপত্যকার দেওয়াল গাছপালায় ঢাকা থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উপত্যকার দেওয়াল যথেষ্ট মসৃণ ও অল্পঢালযুক্ত হয় এবং ঐ অঞ্চলে প্রকৃত 'V' আকৃতি বোঝা যায়। অন্য দিকে, মরু জলবায়ুতে উদ্ভিদের উপস্থিতি থাকে না বলে উপত্যকার দেওয়ালে আবহবিকারের প্রভাব খুব বেশি কিন্তু আবহবিকারগ্রস্ত শিলা যথেষ্ট পরিমাণে অপসারিত হয় না বলে উপত্যকার দেয়াল খাড়া হয়।

উপত্যকার গভীরতা বৃদ্ধিতে তার নিম্নক্ষয় ও পার্শ্বক্ষয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ব'লে তা উপত্যকার আকৃতিকে প্রভাবিত করে। কীজাতীয় শিলা দিয়ে উপত্যকার পার্শ্বদেশ ও নিচের অংশ তৈরি হয়েছে তার উপর নির্ভর করেও উপত্যকার আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। মরিসাওয়া একটি গবেষণার সময়ে লক্ষ করেন, উপকূলীয় বালি ও গ্রাভেল-এর স্তরে উপত্যকাগুলি 'V' আকৃতির, কিন্তু সিল্ট ও কাদার পরিমাণ যেখানে বেশি সেখানে উপত্যকা খাড়া ঢাল বিশিষ্ট। শিলাস্তরের প্রবেশ্যতা ও সচ্ছিদ্রতাও উপত্যকাকে প্রভাবিত করতে পারে। শিলাস্তর বেশি সচ্ছিদ্র হলে, অর্থাৎ শিলার অন্তর্গত কণার মধ্যে শূন্যতা বা ফাঁকের পরিমাণ বেশি হলে তার প্রবেশ্যতা কমে যায় ও ভূপৃষ্ঠ প্রবাহের পরিমাণ ও নদী ঘনত্ব বাড়ে। ফলে নদী অববাহিকায় ভূমিরূপের গ্রথন সূক্ষ্মতর হয়, নদীখাতও গভীরতর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রবেশ্যতা বেশি হলে নদীর জল নিচের স্তরে চলে যায় বলে নদীখাতের গভীরতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

Scanned with CamScanner

৪.৭.২.১ গিরিখাত ও ক্যানিয়ন

সাধারণত পার্বত্য প্রবাহে অববাহিকার ভূমিরূপে উচ্চতার পার্থক্য বেশি থাকে বলে নদী গভীরভাবে নিম্নক্ষয় করে ও গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। সাধারণ অবস্থায় গভীরতার তুলনায় দু পাড়ের অন্তর্বর্তী দূরত্ব বেশি থাকে। কিন্তু নদী যদি কোনো চ্যুতি কিংবা দুর্বল শিলাস্তরকে আশ্রয় করে নিম্নক্ষয় করে, তখন দু পাড়ের দূরত্বের তুলনায় গভীরতা বেড়ে যেতে পারে।

শুষ্ক অঞ্চলের গিরিখাতকে ক্যানিয়ন (Canyon) বলে। জলবায়ুর শুষ্কতার জন্য এসব এলাকায় নদীর পাড়ের আবহবিকারগ্রস্ত শিলাচূর্ণ অপসারিত হয় না ও নদীর দু পাড়ের উচ্চতা কমে না। পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর ক্যানিয়নের নাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এই ক্যানিয়ন অ্যারিজোনা রাজ্যের কলোরাডো মালভূমিতে সৃষ্টি হয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন প্রায় ১ মাইল বা ১৬৬০ মিটারের মতো গভীর। কিন্তু এই ক্যানিয়নের দুই পাড়ের দূরত্ব অনেক বেশি।

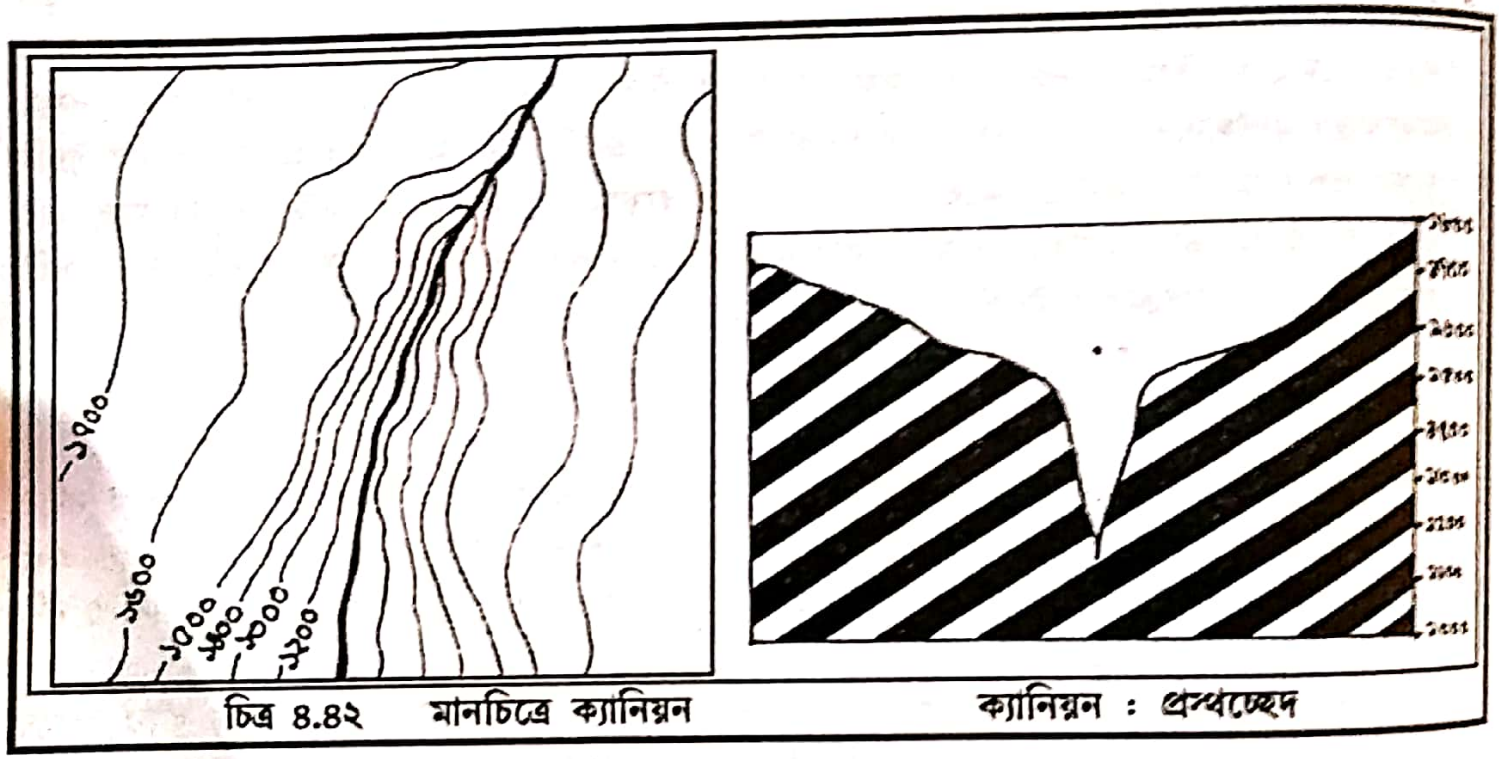

চিত্র ৪.৪২ মানচিত্রে ক্যানিয়ন ক্যানিয়ন : প্রস্থচ্ছেদ

৪.৭.২.২ মন্থকূপ

নদীখাতে শিলাস্তরের ওপর নদীর ক্ষয়ের ফলে অনেক ছোট বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলিকে মন্থকূপ বলে। মন্থকূপ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকায় এবং কখনো কখনো খাত বরাবর নানা আকৃতির গর্তের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এগুলি নলের মতো গভীরও হতে পারে। নদীখাতের শিলাস্তরে যে-বন্ধুরতা থাকে তার ফলে নদীর জলে আলোড়ন ও ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। এই সময়ে ঐ ঘূর্ণির কেন্দ্রে যে-সব বাহিত পাথরের খণ্ড থাকে সেগুলি জলের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিচু ভূমিভাগের ওপর ঘুরতে থাকে। এর ফলে ঐ পাথরের ঘষায় ক্রমশ মসৃণ ও গোল গর্তের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো বড় মন্থকূপে ঘর্ষণকারী এই নুড়ি ও গ্রাভেলের সঞ্চয় দেখা যায়। মন্থনের মতো ঘূর্ণির সাহায্যে এই খাড়া ঢালবিশিষ্ট গর্তের সৃষ্টি হয় বলে একে মন্থকূপ বলা হয়। আবার পাত্রের মতো এর নিচের অংশ বন্ধ থাকে বলে একে ইংরেজিতে 'পট্ হোল্' বলা হয়।

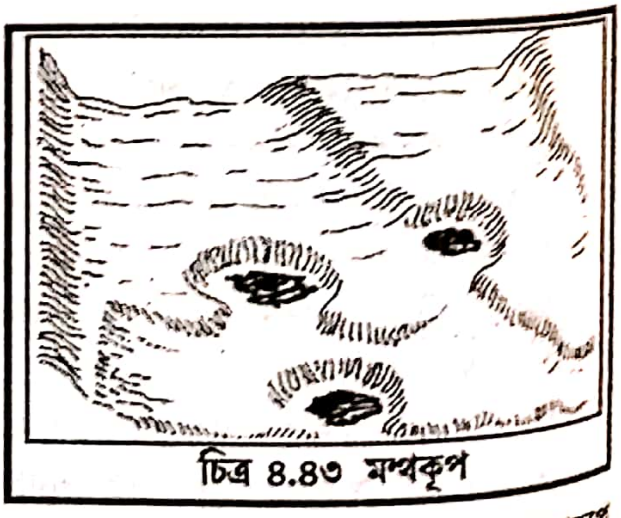

চিত্র ৪.৪৩ মন্থকূপ

Scanned with CamScanner

৪.৭.২.৩ জলপ্রপাত

নদীখাত বরাবর শিলাস্তরের কাঠিন্যের পার্থক্য, চ্যুতির ফলে তৈরি ভৃগুতট নদীতে জলপ্রপাত সৃষ্টি করে। পৃথিবী বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নায়াগ্রা চুনাপাথরের ওপর থেকে নায়াগ্রা শেল শিলাস্তরের ওপর জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু শেল শিলাস্তরের কাঠিন্য চুনাপাথরের তুলনায় অনেক কম। ভারতের রাঁচি মালভূমিতে দামোদর নদীর প্রবাহপথে একটি চ্যুতি-ভৃগুতট বরাবর হুন্ড্রু জলপ্রপাত তৈরি হয়েছে। অমরকন্টক মালভূমির ব্যাসল্ট শিলাস্তরের ওপর থেকে নর্মদা, শোন ইত্যাদি নদী প্রপাত সৃষ্টি ক'রে লাফিয়ে পড়েছে। লাভা মালভূমির টেবিলজাতীয় ভূমিরূপ এসব জলপ্রপাত সৃষ্টির কারণ। নর্মদা নদীর এই জলপ্রপাত কপিলধারা নামে পরিচিত। জব্বলপুরের কাছে ভেরাঘাটে নর্মদা নদী ডলোমাইট ও মার্বেল শিলার ওপর ধুঁয়াধার জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। এই দর্শনীয় জলপ্রপাত ঐ অঞ্চলের ভূমিরূপকে খুব দ্রুত ক্ষয় করছে। এক্ষেত্রে নর্মদা নদীর প্রবাহপথে চ্যুতির উপস্থিতি ও শিলাস্তরের বৈষম্যমূলক ক্ষয় জলপ্রপাত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে ভেনিজুয়েলার কারাও (Carao) নদীর ওপর। এই জলপ্রপাত কয়েকটি প্রপাতের সমষ্টি। এদের মধ্যে একটি প্রপাতের উচ্চতা ২৬৪৮ ফুট (৮০৭·১২ মি.)। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশস্ত জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে লাওসে। এই জলপ্রপাতের নাম খোন্ (Khone) জলপ্রপাত। এটি ৬.৭ মাইল (৪·০২ কি.মি.) চওড়া)।

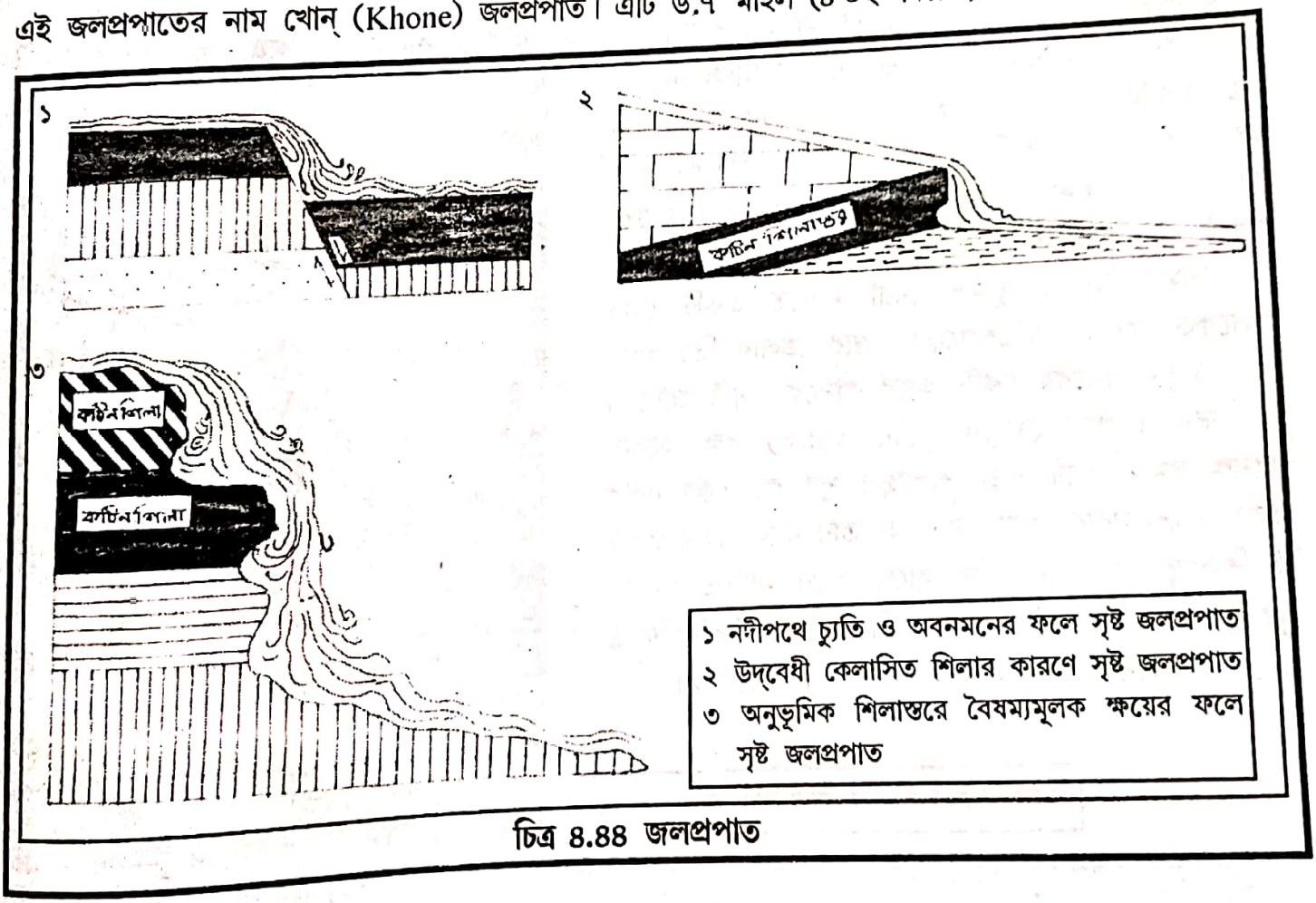

চিত্র ৪.৪৪ জলপ্রপাত

জলপ্রপাতের ফলে লাফিয়ে পড়া জল খাড়া ঢালের নিচে গভীর ও প্রশস্ত গর্তের (Plunge pool) সৃষ্টি করে। ফলে ওপরের শিলাস্তরের নিচের অবলম্বন ক্ষয়ীভূত হয়ে যায়। ওপরের শিলাস্তর ক্রমশ ভেঙে পড়ে ও জলপ্রপাত ঐ ভেঙে পড়া অংশের শেষ বরাবর পিছিয়ে যেতে থাকে, অর্থাৎ

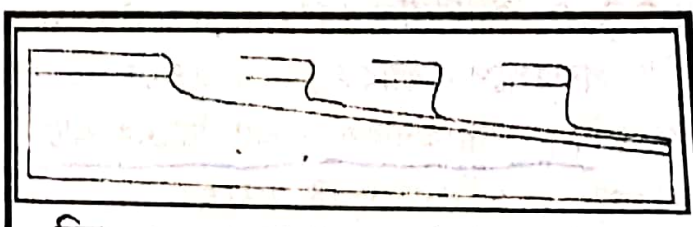

চিত্র ৪.৪৫ জলপ্রপাতের পশ্চাৎ অপসরণ

Scanned with CamScanner

নদীর পশ্চাদপসরণ হয়। ভারতের ইন্দ্রাবতী নদীর ওপর যে-চিত্রকূট জলপ্রপাত রয়েছে তার ওপরের অংশে এই পশ্চাদপসরণ লক্ষ করা যায়।

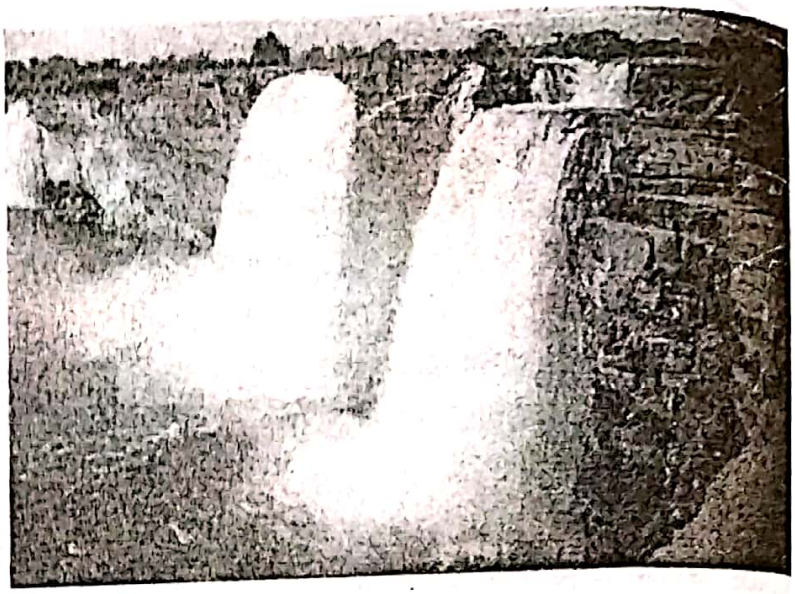

অনুভূমিক শেল ও শেল-চুনাপাথর শিলাস্তরে ইন্দ্রাবতী নদীর ওপর চিত্রকূট জলপ্রপাত

৪.৭.২.৪ কাসকেড (Cascade)

নদীর প্রবাহপথে চ্যুতি, দারণ এবং বৈষম্যমূলক ক্ষয়ের ফলে অনেকসময়ে স্থানীয়ভাবে অল্প দৈর্ঘ্য জুড়ে কয়েকটি ছোট ছোট ধাপ বরাবর নদী দ্রুততর গতিতে আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে প্রবাহিত হয়। একে কাসকেড বলে। দামোদর নদীর অববাহিকায় তার ডানতীরের উপনদী ভেরা একটি কাসকেড সৃষ্টি করে মূলনদীতে মিশেছে। এই খরস্রোত রাজরাপ্পা প্রপাত বলে পরিচিত।

সিমলিপাল উচ্চভূমির খৈরী নদীতে একটি ছোট কাসকেড রয়েছে। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার তিরথ্‌গড়ে শেল ও চুনাপাথরের একটি অপূর্ব কাসকেড সৃষ্টি হয়েছে।

ভন এঙ্গেল (VonEngeln, ১৯৪২) লক্ষ করেন, অনেক সময়ে ধসে পড়া শিলাস্তূপ খুব বড় হলে নদীর প্রবাহ তাকে সরাতে পারে না এবং তার ফলে নদীর প্রবাহ ঐ শিলাস্তূপের ওপর দিয়ে ধাপে ধাপে নামতে থাকে। সুতরাং কাসকেড সৃষ্টির সঙ্গে শিলাস্তূপের উপস্থিতি ও নদীর ক্ষয় এবং পরিবহন ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে।

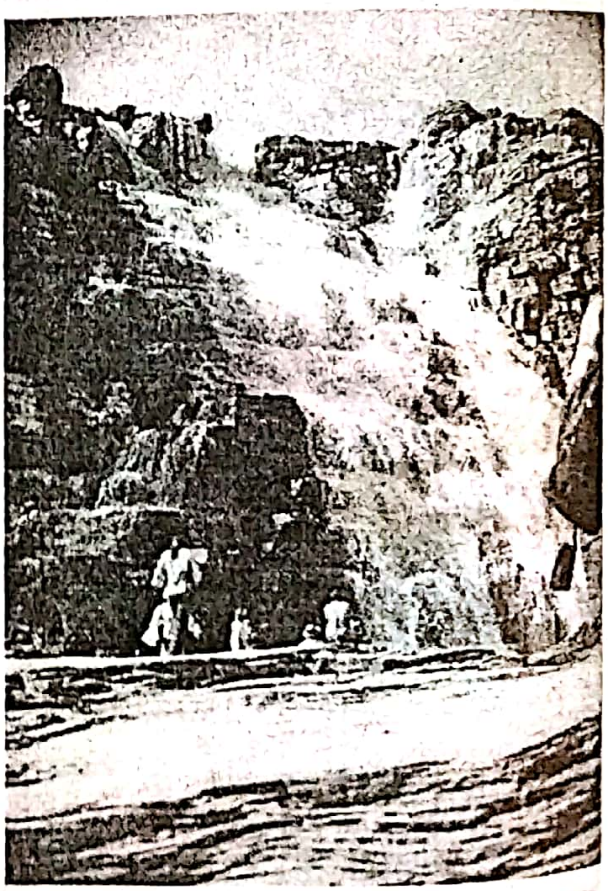

তিরথগড়ে দারণযুক্ত শিলাস্তরে কাসকেড সৃষ্টি

৪.৭.২.৫ ক্যাটারাক্ট্ (Cataract, Rapids)

নদীর প্রবাহপথে একাধিক চ্যুতির প্রভাবে পর পর কয়েকটি জলপ্রপাত সৃষ্টি হলে তাকে ক্যাটারাক্ট্ বা র‍্যাপিড্‌স্ বলে। নীল নদীর প্রবাহপথে আসোয়ানের আগে ৭টি ক্যাটারাক্ট্ রয়েছে। কঙ্গো বা জাইরে স্টানলি বা বয়োমা জলপ্রপাতেও ৭টি ক্যাটারাক্ট্ রয়েছে।

Scanned with CamScanner

৪.৭.২.৬ স্পার

পার্বত্য অংশে কোনো শৈলশিরা যখন কোনো উপত্যকায় এসে শেষ হয়, তাকে স্পার বলে। বন্ধুর এলাকায় যে-সব ক্ষেত্রে নদীর মধ্যে কিছুটা বাঁক লক্ষ করা যায়, সেখানে স্পারগুলি অন্তঃকীলক (Interlocking) হয়, অর্থাৎ ঐ উপত্যকার মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চপ্রবাহের দিকে একটানা দেখা যাবে না, কারণ স্পারগুলি সে-ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। আবার নদী যদি প্রায় সোজা পথে প্রবাহিত হয়, তাহলে স্পারগুলি অন্তঃকীলক হবে না। সাধারণত এক্ষেত্রে গঠনের নিয়ন্ত্রণ নদীর এই সরল প্রবাহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

চিত্র ৪.৪৬ অন্তঃকীলক স্পার

শতদ্রু নদীর উপত্যকায় অন্তঃকীলক স্পার

৪.৭.২.৭ পুল ও রিফ্‌ল্‌

নদীতে বাঁক সৃষ্টি হলে তার বিভিন্ন পর্যায়ে নদীর মধ্যে প্রস্থ বরাবর এবং দৈর্ঘ্য বরাবর বৈষম্যমূলক ক্ষয় হতে থাকে। এর ফলে নদীবাঁকের বাইরের দিকের পাড়ে বা অবতল অংশে পুল বা গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়। এই পুলের ওপরে পাড় থেকে নেমে আসা ভৃগুতট দেখা যায়। কেলার (Keller) নদীর বাঁক সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে পাঁচটি স্তরে পুল ও রিফ্‌ল্‌-এর সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করেছেন। পুল অংশ থেকে ক্ষয় ক'রে নিয়ে যাওয়া বস্তু বা শিলাচূর্ণ রিফ্‌ল্‌ অংশে জমা হয়। তাই নদীর অনুদৈর্ঘ্য প্রতিকৃতি বরাবর পর্যায়ক্রমে পুল ও রিফ্‌ল্‌ লক্ষ করা যায়। রিফ্‌ল্‌ অংশে নদীর গভীরতা কমে যায় এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের নদীতে শুষ্ক গ্রীষ্মকালে ও শুষ্ক শীতকালে ঐ অংশের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। ভূমিরূপের মানচিত্রে (ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগের) নদীর প্রবাহপথের এই অগভীর অংশ 'ফোর্ড' বলে চিহ্নিত হয়। পুল অংশে যে-হেলিকয়ডাল বা কর্ক স্ক্রু-র মতো প্যাঁচানো স্রোত সৃষ্টি হয়, রিফ্‌ল্‌ অংশে এসে তা শেষ হয়। রিফ্‌ল্‌ অংশের অবক্ষেপে নুড়িগুলি অপেক্ষাকৃত বড় থাকে। এই অবক্ষেপ থেকেই ক্রমশ শোল (Shoal) বা নদীর প্রবাহখাতের মাঝখানে নিমজ্জিত বালিয়াড়ি সৃষ্টি হয়। এই শোল থেকেই আবার পয়েন্টবার বা পাড়সংলগ্ন চর তৈরি হয়।

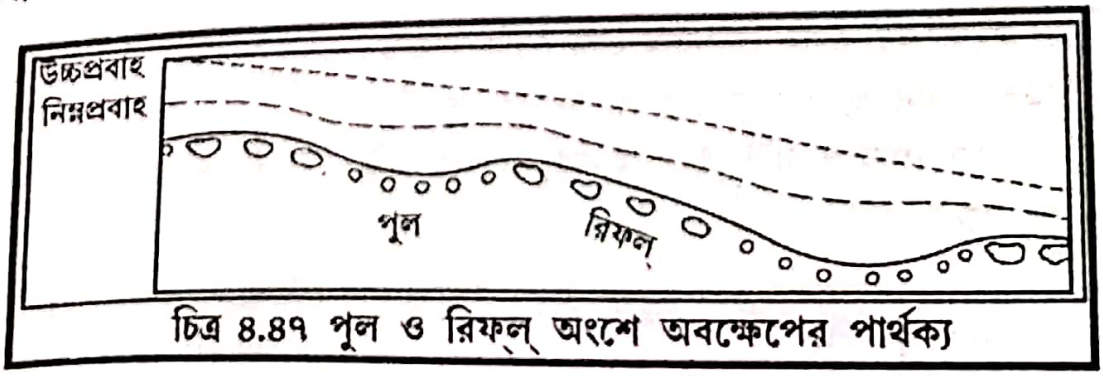

চিত্র ৪.৪৭ পুল ও রিফ্‌ল্‌ অংশে অবক্ষেপের পার্থক্য

Scanned with CamScanner

৪.৭.৪ নদীর বহন (Transportation of river)

৪.৭.৪.১ ভূমিকা

নদীর ক্ষয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আরও দুটি কাজ : বহন ও সঞ্চয়। শিলাস্তরের যে-অংশ নদীর জলের ধাক্কায় আর বাহিত নুড়ির ঘষায় কিংবা নুড়িদের পারস্পরিক সংঘর্ষে ভেঙে খণ্ড হয়, নদী তা বয়ে নিয়ে যায় নিম্নপ্রবাহের দিকে। নদী যখন সেই বাহিত শিলাচূর্ণ বা শিলাখণ্ডকে বহন করতে পারে না তখন তাকে ফেলে যায় বা সঞ্চয় করে।

৪.৭.৪.২ সংজ্ঞা

নদী যখন তার ক্ষয় করা শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণকে জলের ধাক্কায় নিম্নপ্রবাহের দিকে নিয়ে যেতে থাকে, তখন তাকে বহন বলে।

৪.৭.৪.৩ বহনের শক্তি

নদীর তলদেশের বাহিত শিলাচূর্ণ ও শিলাখণ্ডের স্তূপ নদীখাতের তলদেশের বোঝা (Load) বলে পরিচিত। এক্ষেত্রে প্রত্যেক আলগা শিলাখণ্ড নদীর জলেরহ ধাক্কায় ঢাল বরাবর গড়াতে থাকে। বলা বাহুল্য নদীর তলদেশের বোঝার অন্তর্গত সব শিলাখণ্ডের আকার ও আয়তন এবং ভর সমান থাকে না। সুতরাং সবচেয়ে বড় শিলাখণ্ডকে অপসারণ করার উপযুক্ত শক্তি সৃষ্টি হলে তবেই বোঝার অন্তর্গত সব শিলাখণ্ড ও শিলাচূর্ণ বাহিত হতে শুরু করে। যখনই নদীর শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে, তখনই নদী ক্রমশ বড় থেকে ছোট শিলাখণ্ডকে শক্তির ক্রমহ্রাসমানতা অনুযায়ী ফেলে দিতে থাকে।

এইভাবে বহনের সময়ে নদীর তলদেশের প্রত্যেক শিলাখণ্ডের ওপর প্রধানত দুটি বল কাজ করে : অভিকর্ষ বল ও প্রবাহের গতিবেগের বল। এই দুটি বল একে অন্যের বিপরীতে কাজ করে। অভিকর্ষজ বল চায় শিলাখণ্ডকে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে, আর স্রোতের বা জলপ্রবাহের বল চায় তাকে নিম্নপ্রবাহের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে। ফলে পরস্পরের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এখানে মনে রাখতে হবে

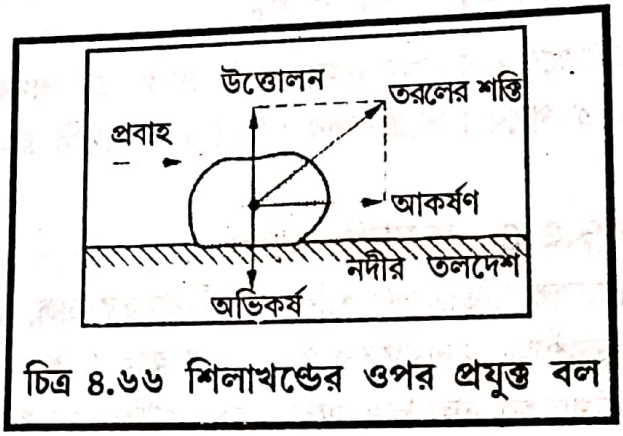

চিত্র ৪.৬৬ শিলাখণ্ডের ওপর প্রযুক্ত বল

Scanned with CamScanner

জলের ঊর্ধ্বমুখী চাপের জন্য জলের ভেতর যে-কোনো শিলাখণ্ডের ওজন জলের বাইরে তার প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম। এর ফলে জলের বাইরে একটি শিলাখণ্ডকে সারাবার জন্য যতটা বলের প্রয়োজন হয় জলের মধ্যে তার পরিমাণ অনেক কম থাকে।

কোনো শিলাখণ্ডকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখার জন্য তার ওপর যে-অভিকর্ষজ বল কাজ করে তার পরিমাণ হল :

$$F_g = (\Pi/6)d^3(y-y_f)$$

F_g = অভিকর্ষ বল
$(y-y_f)$ = জলের মধ্যে ডুবে থাকা শিলাখণ্ডের ওজন
d = শিলাখণ্ডের ব্যাস

শিলাখণ্ডের ওপর কার্যকরী অন্য বল, অর্থাৎ জলের প্রবাহ তাকে নিম্নপ্রবাহের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তোলন বল নদীর তলদেশের ওপর লম্বভাবে কাজ করে। এই বলের উৎস হল নদীর জলের গতিবেগের পার্থক্য থেকে সৃষ্ট হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপের বৈষম্য। জলের গতিবেগ যদি বেশি হয় তাহলে এই চাপের পরিমাণ কম হয়। উত্তোলন বলকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$$F_L = C_L(\rho V_b^2/2)k_1 d^2$$

F_L = উত্তোলন বল
k_1 = শিলাখণ্ডের আকৃতির প্রভাব
ρ = বন্ধুরতা
V_b = খাতের তলদেশের গতিবেগ

শিলাখণ্ডকে টেনে নিয়ে যেতে চায় যে-বল (Tractive force) তা প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরাল কাজ করে। এই বল নদীর জলের গতিবেগের ওপর এবং নদীখাতের আপেক্ষিক বন্ধুরতার ওপর নির্ভরশীল। রেনোল্ডস্ সংখ্যা দিয়ে ঐ বলের পার্থক্য বোঝা যায়। জলের গতিবেগ কম হলে এবং রেনোল্ডস্ সংখ্যার মান কম হলে শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণের চারপাশে একটি সান্দ্র উপস্তর তৈরি হয় এবং গতিবেগের পার্থক্যের ভিত্তিতে আকর্ষণ বল কাজ করে। গতিবেগ বেশি হলে এবং রেনোল্ডস্ সংখ্যার মান বেশি হলে শিলাখণ্ডের নিম্নপ্রবাহের দিকে আলোড়ন সৃষ্টি হবে এবং নিম্নপ্রবাহের দিকে আকর্ষণ বলের ঋণাত্মক চাপ ও উচ্চপ্রবাহের দিকে ধনাত্মক চাপ লক্ষ করা যাবে। এই বলকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় :

$$F_D = C_D(\rho V_b^2/2)k_2 d^2$$

F_D = আকর্ষণ বল

যখন এই দুটি বলের সম্মিলিত শক্তি অভিকর্ষজ বলের তুলনায় বেশি হবে তখনই শিলাখণ্ড অপসারিত হবে।

$$F_L + F_D > F_g$$

এইভাবে নদী যখন কোনো নুড়ি বা গ্রাভেল অথবা গণ্ডশিলাকে গড়িয়ে নিয়ে যায় তখন সেই শিলাখণ্ড ক্রমশ মসৃণ হতে থাকে। তার বন্ধুর কোনাচে অংশগুলি ক্রমশ ক্ষয়ে গোলাকার হয়ে যায়।

৪.৭.৫.৪ অন্যান্য প্রভাব

প্রবাহের গতিবেগের পরিমাণ নদীখাতের ঢাল, বন্ধুরতা, জলের পরিমাণ, নদীখাতের প্রস্থ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। নদীখাতের প্রস্থ বেশি হলে গতিবেগের পরিমাণ কমে ও সহজেই শিলাখণ্ড নদীর তলদেশে জমা হয়। নদীখাতের ঢাল কম হলে জলের গতিশক্তির পরিমাণ কমে ও শিলাখণ্ড থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। আবার

Scanned with CamScanner

যে-নদীর খাত বালিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেখানে গতিবেগ আলোড়িত প্রবাহের কম হলে (প্রতি সেকেন্ডে ১ মিটারের কম) জলের গভীরতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিলাচূর্ণের অপসারণের পরিমাণ কমতে থাকে। গতিবেগের পরিমাণ বেশি হলে (প্রতি সেকেন্ডে ১ মিটারের বেশি) জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলাচূর্ণের বহনের পরিমাণ বাড়বে। জলের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১ মিটার হলে শিলাচূর্ণের বহনের পরিমাণ বিভিন্ন গভীরতায় একই রকম থাকবে। নর্ডিন ও বেভারেজ (Nordin, Beverage, ১৯৬৫) লক্ষ করেন, জলের গতিবেগ কম থাকলে নদীখাতের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অংশে চওড়া অংশে তুলনায় শিলাচূর্ণের পরিবহনের পরিমাণ বাড়ে। জলের গতিবেগ বাড়লে নদীর অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশের পরিবহনের পরিমাণ বাড়ে। সুতরাং নদীর জলের পরিবহন প্রক্রিয়া অবশ্যই নদীখাতের জ্যামিতিক আকৃতির ওপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যে-সব প্রভাব নদীর জলের সাহায্যে শিলাচূর্ণের পরিবহনকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল জলের গতিবেগ, নদীখাতের ঢাল, বন্ধুরতা, জলের সান্দ্রতা, তার কৃন্তন পীড়নের পরিমাণ ইত্যাদি। বিষয়গুলিকে নিচের সমীকরণের প্রতীকের সাহায্যে দেখানো হল:

$$Q_S = f(W, D, V, S, n, \mu, \tau)$$

W = নদীখাতের প্রস্থ
D = নদীখাতের গভীরতা
V = প্রবাহের গতিবেগ
S = নদীখাতের ঢাল
n = বন্ধুরতা
μ = সান্দ্রতা
τ = কৃন্তন বল
Q_S = নদীর পরিবহনের পরিমাণ

বহন প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য

সাধারণভাবে বলা যায়, নদীর স্রোত বা জলের ধাক্কা শিলাচূর্ণ বা শিলাখণ্ডকে বহন করে, কিন্তু ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, বহনের প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। কখনো নদী সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কখনো শিলাখণ্ডকে নদীখাতের তলদেশ বরাবর গড়িয়ে নিয়ে যায়। আবার কখনো জলে দ্রাব্য শিলাস্তরের লবণ নদীর জলে দ্রবীভূত অবস্থায়, কখনো জলের তীব্র ধাক্কায় শিলাখণ্ড নদীখাতের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে নিম্নপ্রবাহের দিকে যেতে থাকে। প্রক্রিয়ার এসব পার্থক্যের ভিত্তিতে নদীর বহনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

গড়ানো প্রক্রিয়া (Rolling)

এই প্রক্রিয়ায় নদী ক্ষয় ক'রে আনা শিলাখণ্ডকে, অর্থাৎ নুড়ি, বালি, গ্রাভেল, বোল্ডার বা গণ্ডশিলাকে নদীখাতের নিচের ভূমি বরাবর গড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে নদীর জলের গতিবেগের চাপ শিলাখণ্ডের ওপর অভিকর্ষজনিত টানের তুলনায় বেশি হওয়া প্রয়োজন। নদীর তলদেশের শিলাচূর্ণের বহন জলের গতিবেগের তুলনায় ধীরগতিতে হয়।

লাফানো প্রক্রিয়ায় পরিবহন (Saltation)

জলের গতিবেগ খুব বেশি থাকলে এবং আলোড়নের পরিমাণ বেশি থাকলে উত্তোলন বল এবং আকর্ষণ বলের পরিমাণ বাড়ে। ফলে শিলাখণ্ড জলের ধাক্কায় একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় লাফিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে অপসারণ চলতে থাকে যতক্ষণ না নদীর গতিবেগ কমে আসে।

Scanned with CamScanner

ভাসমান পরিবহন (Floatation)

শিলাচূর্ণ যখন খুব সূক্ষ্ম হয় তখন নদীর জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় মিহি দানার বালি এক তার চেয়ে সূক্ষ্ম পলি ও কাদার কণা নদীর জলের সঙ্গে ভাসমান অবস্থায় নিম্নপ্রবাহের দিকে বাহিত হয়। এক্ষেত্রে শিলাচূর্ণের আয়তন সূক্ষ্ম বলে জলের ঊর্ধ্বচাপ শিলার কণাকে, অর্থাৎ বালি, পলি বা কাদার কণাকে, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শিলার অবক্ষেপণের গতিবেগ কৃন্তন গতিবেগের তুলনায় কম থাকে। নর্ডিন লক্ষ করেন, নিউ মেক্সিকোর রিও কুয়েরকো-তে ভাসমান বস্তুর পরিমাণ জলের গভীরতাতেই প্রায় একই রকম থাকে। নর্ডিন (১৯৬৩) ও অন্যান্যদের আর একটি গবেষণায় জানা যায়, ঋতুনির্বিশেষে প্রবাহের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অনিত্যবহ নদীর ক্ষেত্রে দক্ষিণপশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নদীগুলিতে ভাসমান পদার্থের পরিমাণ খুব বেশি। ঐ অঞ্চলে নদীর জলে কাদার পরিমাণ খুব বেশি। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভাসমান পদার্থের পরিমাণও বেড়ে যায়। কোলবি (Colby, ১৯৬৪)-র মতে, নদীর জলে ভাসমান শিলাচূর্ণের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এক্ষেত্রে শিলার কণার অবক্ষেপণের গতিবেগ কৃন্তনের গতিবেগ উল্লম্বভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে।

ভাসমান পদার্থের উপস্থিতির জন্য প্লাবনভূমিতে নদীর জলের রং ধূসর বা গেরুয়া হয়। পার্বত্য এলাকায় বা বিশেষভাবে বনভূমিতে ঢাকা কঠিন শিলাযুক্ত পার্বত্য এলাকায় গেলে দেখা যায় নদীর জলের রং নীলচে। প্রকৃতপক্ষে, সে-ক্ষেত্রে নদীর জলের মধ্যে ভাসমান পদার্থের উপস্থিতি নেই বলে নদীর স্বচ্ছ জলে আকাশের রং লক্ষ করা যায়। এই জন্য ঐ জলকে নীলচে মনে হয়। কিন্তু নদী যতই নিম্নপ্রবাহের দিকে এগোতে থাকে এবং জনবসতিপূর্ণ ও কৃষিভূমিতে এলাকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় ততই নদীর জল ঘোলাটে ধূসর হতে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে, হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় যে-ভাবে জনসংখ্যার চাপে বনভূমি ধ্বংস ক'রে তাকে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, তার ফলে ক্রমশই নদীর জলে বোঝার পরিমাণ বাড়ছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভাসমান পদার্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে কারণ কৃষিভূমির সূক্ষ্ম মাটির কণা ক্রমশ জলের সঙ্গে নদীর জলে এসে মিশতে থাকে ও নদীর জল ঘোলাটে হতে থাকে। দার্জিলিং হিমালয়ের গ্যাংটক যাওয়ার রাস্তা তিস্তা নদীর বুক পাড় বরাবর বিস্তৃত হয়েছে। এই রাস্তা থেকে দেখা যায়, যেখানে রঙ্গিত নদী তিস্তায় এসে মিশেছে সেখানে দুই নদীর জলের রঙে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। রমম, পেলিং-এর দিক থেকে নেমে আসা রঙ্গিত নদীর জলে ভাসমান পদার্থের পরিমাণ খুব কম তাই ঐ নদীর জল নীলচে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, পশ্চিম সিকিমে ও উত্তর পশ্চিমে জনবসতির পরিমাণ কম বলে কৃষিজমির পরিমাণ কম ও নদীতে ভাসমান পদার্থের উপস্থিতি কম। অন্যদিকে, তিস্তা নদী কালিম্পং মহকুমার উত্তরঢাল ও পশ্চিমঢাল বরাবর প্রবাহিত হওয়ায় এবং কালিম্পং ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় ঐ অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম মাটি ও শিলাচূর্ণ তিস্তায় এসে পড়ে। ফলে তিস্তা নদীর জলের রং ধূসর ঘোলাটে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্লাবনভূমিতে সব নদীর জলের রঙই ধূসর ও ঘোলাটে, কারণ অববাহিকার এই ভূমিরূপের অংশে সূক্ষ্ম পদার্থের প্রাধান্য থাকে।

নদীর ভাসমান বোঝা ও তলদেশের বোঝার মধ্যে যে-আনুপাতিক সম্পর্ক দেখা যায়, তা বিভিন্ন নদীতে পরিবর্তিত হতে থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নদীগুলির গড় পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, সেখানে নদীর মোট বোঝার ৮০% ভাসমান বোঝা ও ২০% তলদেশের বোঝা। অর্থাৎ ভাসমান বোঝার তুলনায় তলদেশের বোঝার পরিমাণ অনেক কম। ম্যাডক (১৯৫১) এই প্রসঙ্গে একটি নীতির কথা বলেছেন। এই নীতি ভাসমান পদার্থের ঘনত্ব এবং তাদের কণার আয়তনের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত জলের ঘনত্ব বাড়লে অবক্ষেপণ বাড়ে।

Scanned with CamScanner

অবক্ষেপণ বাড়ে।

৪.৭.৫.৩ সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ

প্লাবনভূমি

প্লাবনভূমি হল নদীর দুই পাড়ে বিস্তৃত এমন এক সমতল ভূভাগ যা বর্তমান নদী তার অবক্ষিপ্ত পদার্থের সাহায্যে তৈরি করেছে। এই ভূমিরূপ নদীর বন্যার জলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়। সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে বলা যায়, প্লাবনভূমি একটি পরিবর্তনশীল ভূমিরূপ এবং প্লাবনভূমির একটি নির্দিষ্ট অবস্থা অত্যন্ত স্বল্পজীবী। নদীর গঠনমূলক এবং ক্ষয়কারী কাজের মাধ্যমে প্লাবনভূমি নিয়মিত পরিবর্তিত হতে থাকে। তবে সবসময়ে যে বন্যা হলেই প্লাবনভূমির সব অংশ ডুবে যায় তা নয়, বন্যার জলের পরিমাণের ওপর, জলতলের উচ্চতার ওপর এবং প্লাবনভূমির বিভিন্ন অংশের উচ্চতার ওপর তা নির্ভর করে।

প্লাবনভূমিতে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব— দু ধরনেরই অবক্ষেপ লক্ষ করা যায়। এই অবক্ষিপ্ত পদার্থ নদীর সাহায্যে ক্ষয়ীভূত ও অপসৃত হতে পারে। লিওপোল্ড, ওলম্যান (১৯৫৭)-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে একটি স্বাভাবিক নদীপ্রবাহ বন্যার সময়ে তার গভীরতার চেয়ে ১·৭৫ গুণ বেশি পার্শ্বক্ষয় করে। সাধারণত প্রতি তিন বছরে কোনো নদী তার প্লাবনভূমিকে অন্তত দু বার জলে নিমজ্জিত করে। বন্যার ফলে ভৌমজলস্তরের উন্নতি হয়। বন্যার পলিতে প্লাবনভূমির মাটির উর্বরাশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

অবস্থানের ভিত্তিতে প্লাবনভূমিতে সাধারণত তিন ধরনের অবক্ষেপ লক্ষ করা যায়। ঢাল বরাবর অবক্ষেপ, নদীপ্রবাহের খাতের অবক্ষেপ ও নদীর দু পাড়ের অবক্ষেপ।

নদীর পাড় থেকে বাইরের দিকে অবক্ষিপ্ত বস্তুকণা প্লাবনভূমিতে ঢাল বরাবর জমা হয়। প্লাবনভূমির অবক্ষেপণের ২০%—২৫% এইজাতীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। প্লাবনভূমিকে নদীর জল ও পলি সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বলা যায়।

Scanned with CamScanner

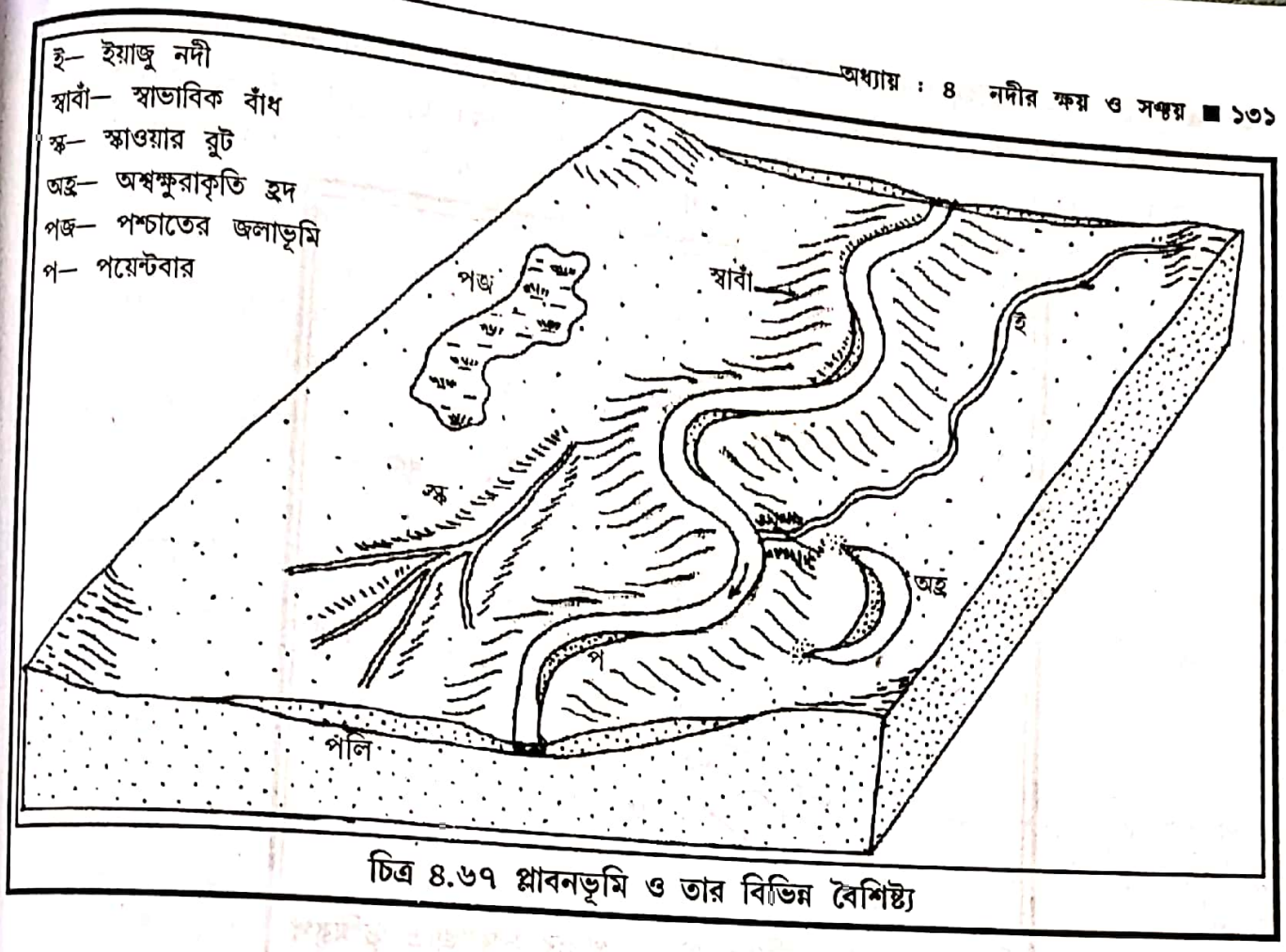

চিত্র ৪.৬৭ প্লাবনভূমি ও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

চর

নদীপ্রবাহের খাতের অন্তর্গত অবক্ষিপ্ত ভূমিরূপগুলির মধ্যে অনুদৈর্ঘ্য চর, অনুপ্রস্থ চর এবং পাড়সংলগ্ন চর (Point bar) অন্যতম।

অনুদৈর্ঘ্য চর হল এমন একটি লম্বা অবক্ষেপজাত ভূমিরূপ যার দীর্ঘতর অক্ষ নদী প্রবাহরেখার সমান্তরাল থাকে। সঞ্চিত কণাগুলি সাধারণত মোটাদানাযুক্ত হয় এবং নিম্নপ্রবাহের দিকে তা ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতর পদার্থের রূপ নেয়। উচ্চপ্রবাহের দিকে এই চর খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং এই অংশ সাধারণত নদীপ্রবাহের সাহায্যে ক্ষয়ীভূত হয়। এই চরের সামনের অংশ সরু ও উঁচু হয় এবং ধীরে ধীরে নিম্নপ্রবাহের দিকে তা নেমে যায়। এই চরে বেশ কয়েকটি তল থাকে। ছিলেকাটা হিরের আকৃতির সঙ্গে এই চরের আকৃতির তুলনা করা হয়।

নদীর প্রবাহের অভিমুখের সঙ্গে আড়াআড়ি কতকগুলি চর লক্ষ করা যায়। এই চর অনুপ্রস্থ (Transverse) চর নামে পরিচিত। সাধারণত এই চরগুলি সংঘবদ্ধভাবে নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশে লক্ষ করা যায়। অবক্ষিপ্ত পদার্থ মূলত বিভিন্ন ধরনের প্রবাহের সময়ে বালির নানা স্তর সৃষ্টি করে। এই চরগুলির মধ্যে রিপল্ বালিয়াড়ি এবং আরো বিভিন্ন ধরনের আড়াআড়ি স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। সাধারণত নদীপ্রবাহের গতি কমে গেলে নদীখাতের নিম্নভূমিতে এই চর সৃষ্টি হয়। স্মিথ্ অবশ্য উচ্চগতিবেগসম্পন্ন নদীতেও বালিয়াড়িগুলির সমন্বয়ে গঠিত এই ধরনের প্রস্থবরাবর বিস্তৃত চর লক্ষ করেন। এই অংশে জলপ্রবাহের ঢাল-এর পাশের অংশের তুলনায় কম থাকে। বিনুনি আকৃতির নদীতে এধরনের চর দেখা যায়।

মিয়েন্ডার প্রবাহ বা বাঁকযুক্ত নদীতে পাড়সংলগ্ন চর একটি উল্লেখযোগ্য অবক্ষেপণজাত ভূমিরূপ। নদীবাঁকের ভেতরের দিকে এই চর জমা হতে দেখা যায়। সাধারণত এই অবক্ষেপণের শুরু হয় নদীখাতের মাঝখানে এবং ক্রমশ সেখান থেকে এই চর নদীর ভেতর দিকের বাঁকে বড় আকারের চর সৃষ্টি করে। নদীর গতি যখন বেশি থাকে, তখন

Scanned with CamScanner

এই চরের উচ্চপ্রবাহের দিক ক্ষয়ীভূত হতে পারে। নদীর প্রবাহের গতিঅত্যন্ত কমে গেলে এজাতীয় চর নদীর বাঁকের উত্তল ও অবতল দুই পাড়েই দেখা যায়। নদীবাঁকে জমা হয় বলে এই চর অনেক সময়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি হয়। এই সব চরের হ্রাস বৃদ্ধি নদীর পৌনঃপুনিক ক্ষয় ও সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল।

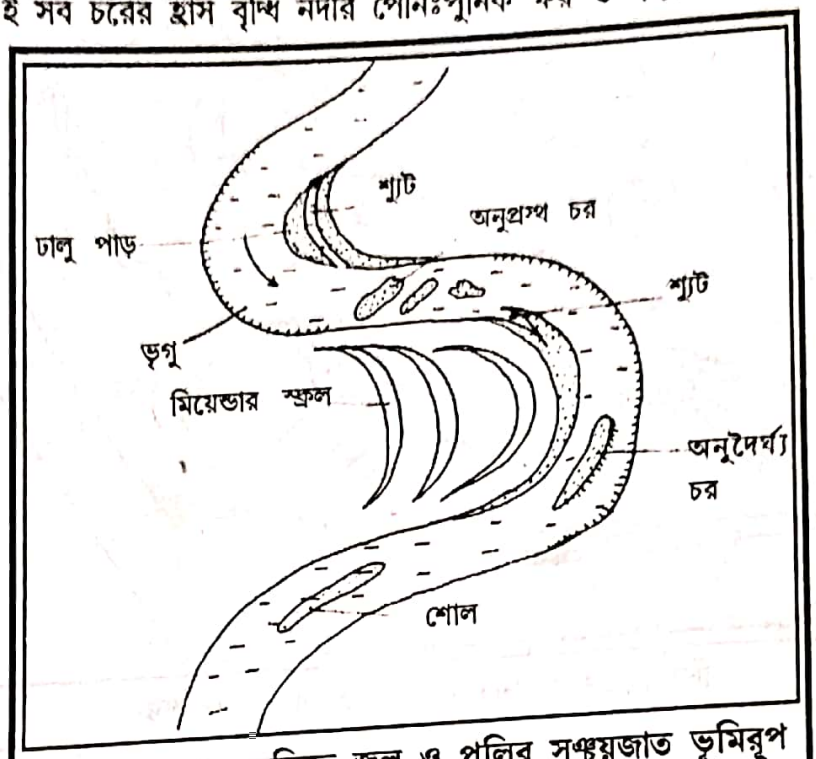

চিত্র ৪.৬৮ প্লাবনভূমিতে জল ও পলির সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ

পাড়সংলগ্ন চর সৃষ্টির প্রক্রিয়া লক্ষ করলে দেখা যায়, অবতল বাঁকে ভৃগুতটের নিচে হেলিকয়ডাল প্রবাহের সাহায্যে নদী কুরে কুরে ক্ষয় ক'রে যে পুল বা গভীর জলভাগ তৈরি করে, সেই ক্ষয়জাত পলি ও শিলাচূর্ণ অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রবাহের দিকে দুটি নদীবাঁকের মধ্যবর্তী অংশে মাঝনদীতে গিয়ে রিফ্‌ল্‌ অংশে জমা হয়। এই সঞ্চিত পলি বাধার ফলে ক্রমশ আরো পলি জমা হয়ে একটি নিমজ্জিত বালিয়াড়ি বা শোল (Shoal) সৃষ্টি হয়। এই শোল ওলটানো নৌকোর মতো দেখতে একটি ভূমিরূপ। বহু নদীতেই, যেখানে পাললিক অবক্ষেপণের প্রাধান্য রয়েছে, এই ভূমিরূপ দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় কোপাই নদীতে, উড়িষ্যার সিমলিপাল এলাকায় দিয়ে প্রবাহিত খৈরি নদীতে এরকম বহু শোল দেখা যায়। সুভাষরঞ্জন বসু কোপাই নদীতে শোল অবক্ষেপের গুরুত্ব লক্ষ করেন। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায়, এই অবক্ষেপ পাললিক অঞ্চলের নদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গড়বেতার কাছে শিলাই নদীতে অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ চর

Scanned with CamScanner

শোল সৃষ্টি হওয়ায় নদীর প্রবাহে যে-বাধা সৃষ্টি হয় তার কারণে নদীর উত্তল পাড়ে প্রবাহের গতিবেগ কমে যায়। ক্রমশ এই শোলের পেছনে অবক্ষেপণ হয়ে পাড়সংলগ্ন চর (Point bar) সৃষ্টি হয়। শুষ্ক ঋতুতে এবং অন্য কোনো কারণে নদীতে জল কমে গেলে পাড়সংলগ্ন চরের শেষ অংশে শোল দেখা যায়।

গ্যাংটকের রাস্তায় তিস্তা নদীতে পাড় সংলগ্ন চর

স্বাভাবিক বাঁধ

নদীর গতিপথে দুই পাড় বরাবর যে-অল্প উঁচু ভূমিরূপ লক্ষ করা যায়, তাকে স্বাভাবিক বাঁধ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্লাবনভূমিতে নদী তার প্রবাহের অংশকে পাশের সমভূমি অঞ্চলের থেকে পৃথক করে এই বাঁধের সাহায্যে। স্বাভাবিক বাঁধ নদীখাতের কাছে সবচেয়ে বেশি উঁচু এবং ধীরে ধীরে প্রবাহের থেকে দূরের দিকে তা নিচু ও ঢালু হয়ে যায়। এই উচ্চতার কারণ হিসেবে বলা যায়, বন্যার সময়ে বড় মাপের বালির দানা নদীপ্রবাহের খাতের অব্যবহিত পরেই সঞ্চিত হয়। বন্যার সময়েও এই বাঁধ নিমজ্জিত হয় না বলে এই ভূমিরূপকে প্লাবনভূমির সবচেয়ে শুষ্ক অংশ বলা যায়। যে-সব নদী প্লাবনভূমি অঞ্চলে কোনো বড় নদীতে উপনদী হিসেবে মিলিত হয়, সে-গুলি সাধারণত এই স্বাভাবিক বাঁধের অবস্থানের জন্য বাধা পায়। তাই সাধারণত তারা নিম্নপ্রবাহের দিকে প্রধান নদীর সমান্তরালভাবে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে স্বাভাবিক বাঁধের কোনো দুর্বল অংশ পেলে সেই অংশের মধ্যে দিয়ে মূল নদীতে সংযুক্ত হয়। এজাতীয় নদীকে 'য়াজু' (Yazoo) নদী বলা হয়। মিসিসিপি অববাহিকার সমধর্মী একটি নদীর নাম অনুসারে এই নামকরণ হয়েছে। স্বাভাবিক বাঁধের ঐ ফাটলকে ক্রিভাস বলা হয়।

স্কাওয়ার রুট (Scour route)

প্লাবনভূমিতে অনেক অগভীর পরিত্যক্ত প্রবাহ লক্ষ করা যায়। এইসব প্রবাহপথ শুধুমাত্র বন্যার সময়ে ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে বলা হয় স্কাওয়ার রুট। সাধারণত এই অংশগুলি নদীর পরিত্যক্ত প্রবাহ বা নতুন কোনো প্রবাহের সূচনা চিহ্নিত করে। বন্যার সময়ে নদীর বাড়তি জল বহনের জন্য প্লাবনভূমিকে ক্ষয় করে এই জলপথ সৃষ্টি হয়।

শ্যুট ও মিয়েন্ডার স্ক্রল (Chute, Meander scroll)

নদী বাঁক নেওয়ার সময়ে এবং পয়েন্টবারের স্থান পরিবর্তনের সময়ে কতকগুলি সমান্তরাল নদীবাঁকের সৃষ্টি হতে পারে। এগুলিকে মিয়েন্ডার স্ক্রল বলা হয়। এই সমস্ত অংশে বাঁকের ভেতর দিকে যে-সব অগভীর জলপথ থাকে, সেগুলি শ্যুট নামে পরিচিত। এইসব জলপথ জল ও পাঁকে পরিপূর্ণ থাকে। শ্যুট হল প্রকৃতপক্ষে একটি সূক্ষ্মকোণবিশিষ্ট নদীর পুরনো অংশ। ধীরে ধীরে কাদা কিংবা বালির প্লাগ-এর সাহায্যে শ্যুটের উচ্চপ্রবাহের দিকের অংশ বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত একটি পয়েন্টবারকে কেটে শ্যুট সৃষ্টি হয় বলে পাড়সংলগ্ন চর বা পয়েন্টবার এর ফলে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

মিয়েন্ডার বা বাঁকযুক্ত নদী প্রতিসম বাঁকসৃষ্টির শেষ পর্যায়ে ঐ বাঁকের 'নেক' বা বাঁকের অন্তবর্তী সংকীর্ণ গ্রীবা ক্ষয় ক'রে সোজাসুজি প্রবাহিত হতে থাকে। এই অবস্থা 'নেক কাট অফ' বলে পরিচিত। এটি উপবৃত্তাকার এমন একটি নদীপ্রবাহের অংশ যাকে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টির ঠিক আগের পর্যায় বলা যায়। ক্রমশ পলি অবক্ষেপ নদীর চূড়ান্ত বাঁকটিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে। বাঁকের পরিত্যক্ত প্রবাহ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে চিহ্নিত হ

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টির সময়ে নদী এত বেশি বাঁক নেয় (প্রায় বৃত্তের মতো) যে সে তার প্রবাহকে আর ঐ বাঁকানো পথে নিয়ে যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, নদীর এই চূড়ান্ত বাঁকসৃষ্টিকে একাধিক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের এই বাঁককে বলিত শিলাস্তরের পাখা ভাঁজের আকৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। এছাড়াও প্লাবনভূমিতে আরও অনেক পরিত্যক্ত প্রবাহপথ বা কাট্-অফ (Cut-off) দেখা যায়।

শিলাই নদীর প্লাবনভূমিতে মিয়েন্ডার কাট্-অফ

পশ্চাতের জলাভূমি

বন্যার সময়ে নদীর জল দু দিকের পাড় ছাপিয়ে তার প্লাবনভূমিকে নিমজ্জিত করার পরে ক্রমশ এই জল নদীতে ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু নিম্নভূমি এলাকা থেকে ঐ বন্যার জল নদীতে ফিরতে পারে না। ঐ জল থেকে জলাভূমি বা পশ্চাতের জলাভূমি (Back swamp) সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি অগভীর একটি জলা যেখানে ক্রমশ উদ্ভিদ জন্মাতে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে, নিম্নগঙ্গা অববাহিকায় এরকম বহু জলাভূমিতে হোগলা ঘাসের বন দেখা যায়।

পশ্চাতের জলাভূমিতে সূক্ষ্মকণাযুক্ত অবক্ষেপ লক্ষ করা যায়। মূলত সিল্ট বা পলি এবং কাদা থেকে এ অবক্ষেপের স্তর সৃষ্টি হয়।

পলি ব্যজনী

পার্বত্য অঞ্চলের একটি নদী যখন সমভূমিতে এসে পড়ে তখন সেই ঢালের পরিবর্তনের সময়ে ঐ নদী তার সম বাহিত পদার্থকে একটি তিনকোনা ভূমিরূপে ছড়িয়ে দেয়। এই ভূমিরূপকে পলি বা পলল ব্যজনী (Alluvial fan) বলা হয়। সাধারণত কোনো গভীর গিরিখাতের শেষে এই ভূমিরূপ লক্ষ করা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, তিস্তা ও দার্জিলিং হিমালয়ের অন্যান্য দক্ষিণবাহিনী নদী শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির সমভূমি অঞ্চলে পড়ার সময়ে এই ধরনের অনেক পলল ব্যজনী সৃষ্টি করেছে। পাখার আকৃতির জন্য এই ভূমিরূপকে পলল ব্যজনী বলা হয়। এই ভূমিভাগের শীর্ষ অংশে ঢালের পরিমাণ ও অবক্ষিপ্ত পদার্থের গভীরতা বেশি থাকে। ধীরে ধীরে বাইরের দিকে এই ঢাল কমে

চিত্র ৪.৬৯ পলি ব্যজনী

Scanned with CamScanner

আসে এবং অবক্ষেপের গভীরতা কমে। একটি পলল ব্যজনীর শীর্ষবিন্দু থেকে বাইরের দিকে ভূমিরূপের প্রতিকৃতি অবতল, কিন্তু আড়াআড়িভাবে এর প্রতিকৃতি উত্তল। এই অংশে নদীর প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনেক শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সাহলায় বাম্পা নদীর বাঁ পাড়ে পলল ব্যজনী

বদ্বীপ

কোনো নদীর বয়ে আনা সূক্ষ্ম কণাগুলি সবশেষে নদীর মোহনায় এসে জমা হয় এবং বদ্বীপের সৃষ্টি করে। মুর এবং অ্যাসকুইথ (১৯৭১) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এটি হল কোনো হ্রদ বা সমুদ্র অঞ্চলে অবক্ষিপ্ত পদার্থের সাহায্যে সৃষ্ট এমন একটি ত্রিকোণ ভূখণ্ড যা নদীর কাজের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং যেটি মাঝে মাঝে জলে ডুবে যেতে পারে।

বদ্বীপের গঠন লক্ষ করলে বোঝা যায়, ঐ ভূমিরূপ সৃষ্টির পেছনে ছোট ও বড় মাপের স্রোত-অবক্ষেপণের (Current bedding) যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সাধারণত বদ্বীপের অবক্ষেপণের স্তরগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১) ওপরের অবক্ষিপ্ত স্তর (**Topset beds**),
২) পুরোভাগের অবক্ষিপ্ত স্তর (**Foreset beds**),
৩) নিচের ভূমিভাগসংলগ্ন অবক্ষিপ্ত স্তর (**Bottomset beds**)।

Scanned with CamScanner